৪। সূরা আর-রাদ ৩য় রুকু(১৯-২৬ আয়াত)

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَفَمَنْ يَّعۡلَمُ اَنَّمَآ اُنۡزِلَ اِلَيۡكَ مِنۡ رَّبِّكَ الۡحَقُّ كَمَنۡ هُوَ اَعۡمٰى ؕ اِنَّمَا ১৩ : ১৯
يَتَذَكَّرُ اُولُوا الۡاَلۡبَابِ

১৯. আপনার রব হতে আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা যে ব্যক্তি সত্য বলে জানে সে কি তার মত যে অন্ধ? উপদেশ গ্রহণ করে শুধু বিবেকসম্পন্নগণই.

অর্থাৎ যারা তাদের প্রভুর কাছ থেকে যা এসেছে তা হক্ব বলে ঈমান এনেছে, তারা এটাও বিশ্বাস করেছে যে, এতে কোন সন্দেহ অসামঞ্জস্যতা নেই। এর একাংশ অন্য অংশের সত্যয়ন করে। কোন প্রকার স্ববিরোধিতা এতে পাওয়া যাবে না। এর যাবতীয় সংবাদ বাস্তব, যাবতীয় আদেশ-নিষেধ ইনসাফে পূর্ণ। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, “সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে আপনার রবের বাণী পরিপূর্ণ।” [সূরা আল-আনআমঃ ১১৫] অর্থাৎ সংবাদ প্রদানে বস্তুনিষ্ঠ এবং আদেশ-নিষেধে ইনসাফপূর্ণ। যারা কুরআনকে এ ধরনের বিশ্বাস করে তারা কি ঐ লোকের মত হতে পারে যে, অন্ধই রয়ে গেছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যা নাযিল হয়েছে তাতে বিশ্বাসী হয়নি এমনকি বোঝার চেষ্টাও করেনি? এ দু’ ব্যক্তির নীতি দুনিয়ায় এক রকম হতে পারে না এবং আখেরাতে তাদের পরিণামও একই ধরনের হতে পারে না। তাই তো আল্লাহ অন্যত্র বলেনঃ জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম। [সূরা আল হাশরঃ ২০] [ইবন কাসীর]

অর্থাৎ আল্লাহর পাঠানো এ শিক্ষা এবং আল্লাহর রাসূলের এ দাওয়াত যারা গ্রহণ করে তারা বুদ্ধিভ্রষ্ট হয় না বরং তারা হয় বিবেকবান, সতর্ক ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। এ ছাড়া দুনিয়ায় তাদের জীবন ও চরিত্র যে রূপ ধারণ করে এবং আখেরাতে তারা যে পরিণাম ফল ভোগ করে পরবর্তী আয়াতগুলোতে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

الَّذِيۡنَ يُوۡفُوۡنَ بِعَهۡدِ اللّٰهِ وَ لَا يَنۡقُضُوۡنَ الۡمِيۡثَاقَ ১৩ : ২০

২০. যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং প্রতিজ্ঞা ভংগ করে না,

وَ الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخَافُوْنَ ১৩ : ২১
سُوْٓءَ الْحِسَابِ

২১. আর আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুন্ন রাখে, ভয় করে তাদের রবকে এবং ভয় করে হিসাবকে,

وَ الَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا ১৩ : ২২
رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً وَّ يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ

২২. আর যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্য ধারণ করে এবং সালাত কায়েম করে, আর আমরা তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং ভাল কাজের দ্বারা মন্দ কাজকে প্রতিহত করে, তাদের জন্যই রয়েছে আখেরাতের শুভ পরিণাম।

এ আয়াতে সত্যিকার বুদ্ধিমান লোকদের পরিচয় তুলে ধরা হচ্ছে যাদের জন্য সুউত্তম পরিণাম রয়েছে, এ শ্রেণীর লোকদের বিশেষ বিশেষ কাজকর্ম ও লক্ষণ রয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম গুণ হচ্ছে, তারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে। অর্থাৎ তারা মুনাফিকদের মত নয় যারা কোন অঙ্গীকার করলে সেটা ভঙ্গ করে, ঝগড়া করলে গালি-গালাজ করে, কথা বললে মিথ্যা বলে, কেউ আমানত রাখলে খিয়ানত করে। [ইবন কাসীর] তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করে, বান্দার সাথে কৃত অঙ্গীকারও পূর্ণ করে। [ফাতহুল কাদীর] অথবা সেই অঙ্গীকার যা 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই' অঙ্গীকার নামে পরিচিত, যার কথা সূরা আ 'রাফে (১৭২নং আয়াতে) বিবৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে 'তারা কোন অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না' ঐ অঙ্গীকারও এর অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো উম্মতের লোকেরা আপন নবীর সাথে সম্পাদন করে এবং ঐ সব অঙ্গীকারও বুঝানো হয়েছে, যেগুলো মানবজাতি একে অপরের সাথে করে। সেগুলো তারা ভঙ্গ করে না। অনুরূপভাবে অঙ্গীকারের মধ্যে তাও পড়ে যা করার জন্য আল্লাহ তার বান্দাদের নির্দেশ দিয়েছেন যেমন, ফরয ও ওয়াজিব কাজসমুহ। অনরূপভাবে তাও

এর অন্তর্ভুক্ত যা নিজেরা নিজেদের উপর বাধ্য করে নিয়েছে যেমন, মানত। [ফাতহুল কাদীর] কাতাদা বলেন, আল্লাহ তা'আলা অঙ্গীকার ঠিক রাখা এবং ভঙ্গ না করার কথা কুরআনে বিশোর্ধ স্থানে উল্লেখ করেছেন। [তাবারী] কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে। আর তা হচ্ছে সৃষ্টির প্রারম্ভে যা আদমের পিঠে নেয়া হয়েছিল। [কুরতুবী]

তৃতীয় গুণ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা যেসব সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ করেছেন, তারা সেগুলো বজায় রাখে। আয়াতের প্রকাশ্য ভাষ্য থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, এটা একটি সাধারণ নির্দেশ। সে অনুসারে এটার অর্থ এমন সব সম্পর্ক, যেগুলো সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষের সামগ্রিক জীবনের কল্যাণ ও সাফল্য নিশ্চিত হয়। যেগুলোকে আল্লাহ ঠিক রাখার নির্দেশ দিয়েছেন এবং কর্তন করতে নিষেধ করেছেন। তবে আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখা নিঃসন্দেহে এর অন্তর্ভুক্ত। [ফাতহুল কাদীর] কোন কোন তাফসীরবিদ বলেনঃ এর অর্থ এই যে, তারা ঈমানের সাথে সৎকর্মকে অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাসের সাথে পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি এবং তাদের গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাসকে যুক্ত করে। [কুরতুবী]

চতুর্থ গুণ হচ্ছে, তারা তাদের রবকে ভয় করে। যে ভয় তাদেরকে কর্তব্য কর্ম করতে এবং যা নিষেধ করেছে তা পরিত্যাগ করতে বাধ্য করে। [ফাতহুল কাদীর] অথবা আল্লাহ যে সম্পর্ক ঠিক রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন সে ব্যাপারে তাদের রবকে ভয় করে। [কুরতুবী]

পঞ্চম গুণ হচ্ছে, তারা মন্দ হিসাবকে ভয় করে। 'মন্দ হিসাব' বলে কঠোর ও পুংখানুপুংখ হিসাব বুঝানো হয়েছে।

ষষ্ঠ গুণ হচ্ছে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার আশায় অকৃত্রিমভাবে ধৈর্যধারণ করে। প্রচলিত কথায় কোন বিপদ ও কষ্টে ধৈর্যধারণ করাকেই সবরের অর্থ মনে করা হয়। কিন্তু আরবী ভাষায় এর অর্থ আরও অনেক ব্যাপক। কারণ, আসল অর্থ হচ্ছে স্বভাব-বিরুদ্ধ বিষয়াদির কারণে অস্থির না হওয়া; বরং দৃঢ়তা সহকারে নিজের কাজে ব্যাপৃত থাকা। এ কারণেই এর তিনটি প্রকার বর্ণনা করা হয়।

(এক) صَبْرٌ عَلٰى الطَّاعَةِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-বিধান পালনে দৃঢ় থাকা এবং (দুই) صَبْرٌ عَنِ الْمَعْصِيَةِ অর্থাৎ গোনাহ থেকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে দৃঢ় থাকা। (তিন) صَبْرٌ عَلٰى الأَقْدار বিপদাপদে নিজের ঈমানের উপর অটল থাকা। [ইবনুল কাইয়্যেম, মাদারিজুস সালেকীনঃ ২/১৫৫] আয়াতে সবরের সাথে (ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ) কথাটি যুক্ত হয়ে ব্যক্ত করেছে যে, সবর সর্বাবস্থায় শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় নয়। শুধুমাত্র যারা একমাত্র আল্লাহর জন্যই সবর করবে তাদেরই এ সওয়াব। **[**ফাতহুল কাদীর**]**

সত্যিকার অর্থে যারা প্রথম ধাক্কায় সবর ধরতে পেরেছে তারাই প্রকৃতভাবে সবরকারী। কেননা, যারা সবর করেনি তারাও কোন না কোন সময় সবর করতে বাধ্য হয়। আর এ ধরনের যেহেতু অপারগ অবস্থায় সেহেতু তা গ্রহণযোগ্য নয়। যে সবর ইচ্ছাধীন নয়, তার বিশেষ কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। এরূপ অনিচ্ছাধীন কাজের আদেশ আল্লাহ তা'আলা দেন না। সুতরাং এখানে যে সবরের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে তা হচ্ছে, তারা নিজেদের প্রবৃত্তি ও আকাংখা নিয়ন্ত্রণ করে, নিজেদের আবেগ, অনুভূতি ও ঝোঁক প্রবণতাকে নিয়ম ও সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখে, আল্লাহর নাফরমানিতে বিভিন্ন স্বার্থলাভ ও ভোগ-লালসা চরিতার্থ হওয়ার সুযোগ দেখে পা পিছলে যায় না এবং আল্লাহর হুকুম মেনে চলার পথে যেসব ক্ষতি ও কষ্টের আশংকা দেখা দেয় সেসব বরদাশত করে যেতে থাকে। এ দৃষ্টিতে বিচার করলে মুমিন আসলে পুরোপুরি একটি সবরের জীবন যাপন করে। কারণ সে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় এবং আখেরাতের স্থায়ী পরিণাম ফলের প্রতি দৃষ্টি রেখে এ দুনিয়ায় আত্মসংযম করতে থাকে এবং সবরের সাথে মনের প্রতিটি পাপ প্রবণতার মোকাবিলা করে। **[**দেখুন, ইবনুল কাইয়্যেম, মাদারিজুস সালেকীন, মানযিলাতুস সাবর

সপ্তম গুণ হচ্ছে, সালাত কায়েম করা। এর অর্থ পূর্ণ আদব ও শর্ত এবং বিনয় ও নম্রতা সহকারে যেভাবে আল্লাহ তা ফরয করেছেন সেভাবে সময়মত আদায় করা। এখানে ফরয সালাতই উদ্দেশ্য। আবার ব্যাপক সালাতও উদ্দেশ্য হতে পারে। [ফাতহুল কাদীর]

অষ্টম গুণ হচ্ছে, যারা আল্লাহ প্রদত্ত রিযক থেকে কিছু আল্লাহর নামেও ব্যয় করে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাছে চান না; বরং নিজেরই দেয়া রির্যকের কিছু অংশ তোমাদের কাছে চান। এটা দেয়ার ব্যাপারে স্বভাবতঃ তোমাদের ইতস্ততঃ করা উচিত নয়। এখানে অর্থ-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করার সাথে (سِرًّا وَعَلَانِيَةً) শব্দ দুটি যুক্ত হওয়ায় বুঝা যায় যে, দান-সদকা সর্বত্র গোপনে করাই সুন্নত নয়; বরং মাঝে মাঝে প্রকাশ্যে করাও দুরস্ত ও শুদ্ধ। এ জন্যই আলেমগণ বলেন যে, যাকাত ও ওয়াজিব সদকা প্রকাশ্যে দেয়াই উত্তম এবং গোপনে দেয়া সমীচীন নয়- যাতে অন্যরাও শিক্ষা ও উৎসাহ পায়। তবে নফল দান-সদকা গোপনে দেয়াই উত্তম। যেসব হাদীসে গোপনে দেয়ার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোতে নফল সদকা সম্পর্কেই বলা হয়েছে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

নবম গুণ হচ্ছে, তারা মন্দকে ভাল দ্বারা, শত্রুতাকে বন্ধুত্ব দ্বারা এবং অন্যায় ও জুলুমকে ক্ষমা ও মার্জনা দ্বারা প্রতিহত করে। মন্দের জবাবে মন্দ ব্যবহার করে না। অর্থাৎ তারা মন্দের মোকাবিলায় মন্দ করে না বরং ভালো করে। তারা অন্যায়ের মোকাবিলা অন্যায়কে সাহায্য না করে ন্যায়কে সাহায্য করে। কেউ তাদের প্রতি যতই জুলুম করুক না কেন তার জবাবে তারা পাল্টা জুলুম করে না বরং ইনসাফ করে। কেউ তাদের বিরুদ্ধে যতই বিশ্বাস ভঙ্গ করুক না কেন জবাবে তারা বিশ্বস্ত আচরণই করে থাকে। এর সমার্থে পবিত্র কুরআনে আরো অনেক আয়াত এসেছে। [যেমন,

اِدۡفَعۡ بِالَّتِىۡ هِىَ اَحۡسَنُ السَّيِّئَةَ ؕ نَحۡنُ اَعۡلَمُ بِمَا يَصِفُوۡنَ ২৩ : ৯৬

মন্দের মুকাবিলা করুন যা উত্তম তা দ্বারা; তারা (আমাকে) যে গুণে গুণান্বিত করে আমরা সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত।সূরা আল-মু'মিনূনঃ ৯৬,

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾

অর্থাৎ, মন্দের জবাব উত্তম পদ্ধতিতে দাও, (যদি তোমরা এমনটি কর) তাহলে যে ব্যক্তি তোমার শত্রু, সে এমন হয়ে যাবে যেন সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। (সূরা হা-মীম সাজদাহ: ৩৪)

কোন সময় কোন গোনাহ হয়ে গেলে তারা অধিকতর যত্ন সহকারে অধিক পরিমাণে ইবাদাত করে। ফলে গোনাহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ’আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেনঃ ‘পাপের পর পূণ্য করে নাও, তাহলে তা পাপকে মিটিয়ে দেবে।’ [মুস্তাদরাকে হাকেম ১/১২১ নং ১৭৮]

কোন ব্যাপারে কারো সাথে অঙ্গীকার করে পরবর্তীতে তা ভঙ্গ করার পরিণাম কি?

উত্তর : প্রথমতঃ বিনা ওযরে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা কাবীরা গুনাহ (মায়েদাহ ৫/০১; যাহাবী, কিতাবুল কাবায়ের ১/১৬৮)। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘যার অঙ্গীকার পূরণ নেই তার দ্বীন নেই’ (আহমাদ হা/১২৪০৬; মিশকাত হা/৩৫;)। দ্বিতীয়তঃ এটি মুনাফিকের লক্ষণ (বুখারী হা/৩৪; মিশকাত হা/৫৬)। তৃতীয়তঃ এরূপ ব্যক্তি আল্লাহর লা‘নতপ্রাপ্ত হয় এবং তাদের অন্তর শক্ত হয়ে যায় (মায়েদাহ ৫/১৩)। চতূর্থতঃ এর কুপ্রভাবে সমাজে অশান্তি ও হত্যাকান্ড ছড়িয়ে পড়ে (হাকেম হা/২৫৭৭; ছহীহাহ হা/১০৭)। পঞ্চমতঃ অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের আল্লাহ তা‘আলা নিকৃষ্ট সৃষ্টি (شر الدواب) বলে আখ্যায়িত করেছেন (আনফাল ৮/৫৫-৫৬)। অতএব যেকোন মূল্যে অঙ্গীকার পূর্ণ করা জান্নাত পিয়াসী মুমিনের আবশ্য কর্তব্য। স্মর্তব্য যে, ভুলে যাওয়া, বাধ্যগত অবস্থা, হারাম কাজ করা বা ওয়াজিব তরক করার ব্যাপারে অঙ্গীকার করা, হঠাৎ রোগ-শোকে আক্রান্ত হওয়া প্রভৃতি কারণবশতঃ অঙ্গীকার ভঙ্গের ব্যাপারে মুমিন ব্যক্তি ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে ইনশাআল্লাহ (বাক্বারাহ ২/১৮৬; ইবনে মাজাহ হা/২০৪৫)।

১৩ : ২৩ جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَ اَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيّٰتِهِمْ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ

২৩. স্থায়ী জান্নাত, তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকাজ করেছে তারাও। আর ফেরেশতাগণ তাদের কাছে উপস্থিত হবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে,

১৩ : ২৪ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

২৪. এবং বলবে, তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি; আর আখেরাতের এ পরিণাম কতই না উত্তম!

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আনুগত্যশীলদের নয়টি গুণ বর্ণনা করার পর তাদের প্রতিদান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, তাদের জন্যই রয়েছে আখেরাতের সাফল্য। আয়াতে বর্ণিত دار শব্দের অর্থ এখানে আখেরাত। [ফাতহুল কাদীর] আর এ আয়াতের প্রথমেই আখেরাতের সাফল্য বর্ণিত হয়েছে যে, জান্নাতে আদনে তারা থাকবে। عدن শব্দের অর্থ স্থায়ী আবাস। উদ্দেশ্য এই যে, এসব জান্নাত থেকে তাদেরকে বহিস্কার করা হবে না; বরং এগুলোতে তাদের অবস্থান চিরস্থায়ী হবে। [ইবন কাসীর] কেউ কেউ বলেনঃ জান্নাতের মধ্যস্থলের নাম আদন। জান্নাতের স্থানসমূহের মধ্যে এটা উচ্চস্তরের। [ফাতহুল কাদীর] দাহহাক বলেনঃ عدن হলো জান্নাতনগরীর নাম। যাতে রাসূল, নবী, শহীদ এবং হেদায়াতের ইমামগণ থাকবে। মানুষজন থাকবে তাদের চারপাশে। আর অন্যান্য জান্নাতসমূহ এর চারপাশে থাকবে। [ইবন কাসীর]

এরপর তাদের জন্য আরো একটি পুরস্কার উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ তা'আলার এ নেয়ামত শুধু তাদের ব্যক্তিসত্তা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং তাদের বাপ-দাদা, স্ত্রী ও সন্তানরাও এর অংশ পাবে। শর্ত এই যে, তাদেরকে এর উপযুক্ত হতে হবে। এর নূন্যতম স্তর হচ্ছে মুসলিম হওয়া। [ফাতহুল কাদীর] উদ্দেশ্য এই যে, তাদের বাপ-দাদা ও স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততিদের আমল যদিও এ স্তরে পৌছার যোগ্য নয়; কিন্তু আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের খাতিরে তাদেরকেও এ উচ্চস্তরে পৌছে দেয়া হবে। [কুরতুবী] অন্যত্র আল্লাহ বলেন "এবং যারা ঈমান আনে আর তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী হয়, তাদের সাথে মিলিত করব তাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাদের কর্মফল আমি একটুও কমাবো না।" [সূরা আত-তূরঃ ২১]

এখান থেকে যেমন এটা জানা গেল যে, মহান আল্লাহ আত্মীয়দেরকে জান্নাতে একত্র করে দেবেন, তেমন এটাও জানা গেল যে, যদি কারো কাছে ঈমান ও সৎ আমলের সম্বল না থাকে তাহলে সে জান্নাতে যাবে না, যদিও তার অন্যান্য অত্যন্ত নিকটাত্মীয় জান্নাতে চলে যায়। কেননা জান্নাতে প্রবেশ জাত-কূলের ভিত্তিতে হয় না, বরং ঈমান ও সৎ আমলের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। মহানবী (সাঃ) বলেন, "যাকে তার আমল পিছে ছেড়ে দেয়, তার বংশ তাকে সামনে বাড়াবে না।" (মুসলিম)

এরপর তাদের আরও একটি আখেরাতের সাফল্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফিরিশতারা তাদেরকে সালাম করতে করতে প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং বলবেঃ সবরের কারণে তোমরা যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছ। [ফাতহুল কাদীর] এটা আখেরাতের কতই না উত্তম পরিণাম। অর্থাৎ তারা তাদেরকে এ সুখবর দেবে যে, এখন তোমরা এমন জায়গায় এসেছে যেখানে পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজমান। এখন তোমরা এখানে সব রকমের আপদ-বিপদ, কষ্ট, কাঠিন্য, কঠোর পরিশ্রম, শংকা ও আতংকমুক্ত। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে প্রথম যে দলটি জান্নাতে যাবে তারা হলেন দরিদ্র মুহাজিরগণ। যাদের দ্বারা সীমান্ত পাহারা দেয়া হয়। খারাপ অবস্থায় তাদের সাহায্য নেয়া হয়। তাদের অনেকেই এমনভাবে মারা যায় যে, তাদের মনে অনেক অপূর্ণ বাসনা রয়েই গেছে।

আল্লাহ্ তা’আলা ফেরেশতাদের বলবেনঃ তোমরা যাও এবং তাদেরকে সালাম-সম্ভাষণ জানাও। ফেরেশতাগণ বলবেনঃ আমরা আপনার আসমানের বাসিন্দা, আপনার শ্রেষ্ট সৃষ্টির অন্যতম তারপরও কি আপনি আমাদেরকে তাদেরকে সম্মান জানানোর জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন। আল্লাহ বলবেনঃ তারা আমার এমন বান্দা ছিল যারা কেবলমাত্র আমার ইবাদত করত। আমার সাথে সামান্যও শির্ক করেনি। তাদের দ্বারা সীমান্ত পাহারা দেয়া হতো এবং বিপজ্জনক সময়ে তাদের সাহায্য নেয়া হত। তারা এমনভাবে মারা গেছে যে, তাদের মনের বাসনা মনেই রয়ে গেছে তা তারা পূরণ করতে পারেনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন ফেরেশতাগণ তাদের কাছে বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করে তাদেরকে সাদর-সম্ভাষণ জানাবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি; কত ভাল এ পরিণাম। [মুসনাদে আহমাদঃ ২/১৬৮]

“তাদেরকে বলা হবে, তোমরা শান্তিতে নিরাপত্তার সাথে এতে প্রবেশ কর।আর আমরা তাদের অন্তর হতে বিদ্বেষ দূর করব তারা ভাইয়ের মত পরস্পর মুখোমুখি হয়ে আসনে অবস্থান করবে .সেখানে তাদেরকে অবসাদ স্পর্শ করবে না এবং তারা সেখান থেকে বহিস্কৃতও হবে না।সূরা হিজর ৪৬-৪৮

অন্য আয়াতেও তা বলা হয়েছে, “যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দিয়েছেন যেখানে ক্লেশ আমাদেরকে স্পর্শ করে না এবং ক্লান্তিও স্পর্শ করে না।” [সূরা সাবাঃ ৩৫] দুনিয়ার অবস্থা এর বিপরীত।

কুরআনুল কারীম এ সম্ভাবনাকেও একটি বাক্যে নাকচ করে দিয়েছেঃ (لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا) [সূরা আল-কাহফঃ ১০৮] অর্থাৎ, তারাও সেখান থেকে ফিরে আসার বাসনা কোন সময়ই পোষণ করবে না।